কেন?
তসলিমা নাসরিন

অ্যান্টিএজিং, ক্লিনসার্স, এক্সফলিয়েটর্স, মাস্কস, আই ব্রাউজ, আই লাইনার্স, আই শ্যাডো, বেস মেকআপ, ব্লাশ, ব্রোঞ্জার্স, কনসিলার, ইলুমিনেটর্স, লিপ গ্লস, লিপ বাম, লিপ লাইনার্স, লিপস্টিক, নেইল পলিশ .... এরকম সহস্র সামগ্রী আজ বাজারে কেন? কাদের ব্যবহারের জন্য? এর উত্তর আমরা সকলেই জানি। মেয়েদের। আমার প্রশ্ন, কেন মেয়েদের এসব ব্যবহার করতে হবে? কেন মেয়েদের আসল চেহারাকে আড়াল করতে হবে নানান রঙ দিয়ে? কেন বানাতে হবে নকল একটি মুখ? নকল চোখ, নকল ঠোঁট, নকল গাল? এই প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে মেয়েরা, কারণ নিজেদের সত্যিকার চেহারা নিয়ে তারা হীনমন্যতায় ভোগে। কে এই হীনমন্যতাবোধটি জাগালো? কে বলেছে মেয়েদের মুখে কোনও ত্রুটি আছে, তাই অজস্র প্রসাধন মেখে সেই মুখকে ত্রুটিমুক্ত করতে হবে! ত্রুটিমুক্ত করলে তারা *সুন্দরী* আখ্যা পাবে!

মেয়েরা তটস্থ। খাবে না। খেলে মেদ জমবে শরীরে। কোথাও মেদ জমতে দেওয়া যাবে না। বুকের মাপ এই হতে হবে, কোমর ওই, পেট সেই, নিতম্ব এমন, উরু তেমন। সব কিছুরই মাপ নির্দিষ্ট করা আছে। সেই মাপ মতো শরীর বানাতে মেয়েরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। খাবার দেখলে ভয়। না খেতে খেতে মেয়েদের অনেকে আজ অ্যানোরেক্সিয়া আর বুলিমিয়া রোগে ভুগছে। মেয়েদের শরীরের আকার আকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কী মাপ হওয়া উচিত, তা তৈরি করছে কারা? শরীর

নিয়ে মাপজোকের অংক কষছে কারা? কারা বলছে কোনও একটি মাপের মধ্যে শরীরকে না ফেললে সেই শরীর *সুন্দর* নয়? সেই মেয়ে *সুন্দরী* নয়?

মেয়েদের *শরীর*-এর জন্য বিশ্ব ব্যতিব্যস্ত। তাদের পোশাক এবং অলঙ্কারের অন্ত নেই। চারদিকে সাজ সাজ রব। শরীর সাজাও। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবদি সাজাও। এটা পরো। ওটা মাখো। ফুটফুটে ঝলমলে চকচকে রাখো সর্বাঙ্গ। কিন্তু, কেন? কার জন্য? মেয়েরা কি একবারও ভাবে, কার জন্য? কাকে তৃপ্ত এবং তুষ্ট করার জন্য? অনেক মেয়েই জোর দিয়ে বলতে চেষ্টা করবে যে, নিজেদের জন্যই তারা সাজে, নিজের ভালো লাগাই মূল কথা। বটে। ওরকম মনে হয়। কিন্তু, *ভালো লাগা* এবং *না লাগার* উদ্রেক হওয়ার পিছনে দীর্ঘকালের *শিক্ষা* থাকে, তা কে অস্বীকার করবে? কে অস্বীকার করবে নারীকে সাজসজ্জা করানোর ইতিহাস?

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী হচ্ছে পণ্য। পুরুষের ভোগের সামগ্রী। কেউ মানুক না মানুক, এ কথা সত্য। ঠিক যে রকম রূপ হলে পুরুষের উত্তেজনা জাগে, নারীবস্তুটিকে সেই রকম হতে হয়। এই নারীবস্তুটিকে ঠিক সেই রকম দেখতে শুনতে হতে হয়, যে রকম হলে পুরুষের শরীর এবং মনের আরাম হয়। নারীকে জন্ম থেকে মৃত্যু অবদি যে সাজগুলো এবং যে কাজগুলো করতে হয়, তার সবই পুরুষ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য। নারীর সতীত্ব, মাতৃত্ব , নত ও নম্র চরিত্র-রক্ষা সবই পুরুষের স্বার্থে। পুরুষ যেন নারীকে তার অধিকৃত সম্পত্তি এবং ক্রীতদাসী হিসেবে চমৎকার ব্যবহার করতে পারে। নারীকে কুক্ষিগত করার নানা রকম পদ্ধতির চল আছে। সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতির নাম *প্রেম*। প্রেম নারীকে, এমনকী সবল নারীকেও এমন দুর্বল করে, এমন গলিয়ে ফেলে যেন

পুরুষের চব্য চোষ্য লেহ্য, পেয় হওয়া ছাড়া নারীর আর কোনও উপায় না থাকে। সংসার মঞ্চে স্ত্রীর ভূমিকায় যাওয়ার আগে প্রেমিকার মহড়া চলে। এই মহড়ায় প্রেমিক পুরুষটির জন্য ত্যাগে এবং তিতিক্ষায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারলে নারী উতরে যায়।

সুন্দরী। এই বিশেষণটি এবং ধারণাটি পুরুষতন্ত্রে বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারী উভয়েরই তৈরি। তারাই নির্ধারণ করে কোন শরীরের নারীকে *সুন্দরী* বলে আখ্যা দেওয়া যাবে। তাদের দখলে আছে প্রচার এবং পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্য। প্রচার হয়ে গেল ওই শরীরটি *সুন্দর,* অমনি ওই শরীরের মতো বুকপেটকটিউরুনিতম্ব বানানোর আয়োজন শুরু হয়ে যায়। ট্রেডমিল, এক্সারসাইজ বাইক, লাইপোসাকসান, প্লাস্টিক সার্জারি, সিলিকন ব্রেস্ট। বাজার ছেয়ে যায় পণ্যে, সেই পণ্যের ওপর সঙ্গে সঙ্গে নারীর দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে অথবা তাদের ধাককা দিয়ে হুমড়ি খাওয়ানো হয়। নারীকে *সুন্দরী* হতে হবে। সুন্দরী না হলে এই সমাজে তার কোনও মূল্য নেই। সুন্দরী না হলে তার বন্ধু থাকবে না, বান্ধব থাকবে না, প্রেম হবে না, বিয়েও হবে না ভালো, ভালো চাকরি জুটবে না, কাজকম্মের ফল পাবে না, একঘরে হয়ে পড়ে থাকতে হবে। নারী তাই প্রাণপণে *পণ্য* হতে চায়। যেন সে বিকোয় ভালো। যেন তার শরীরটি ভালো খায় লোকে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে নারী *হঠাৎ* শেখে না। শেখে জন্ম থেকেই। বাড়ির আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে শেখে, বাইরে পা বাড়িয়েই শেখে। রেডিও টেলিভিশনে শেখে, পত্র পত্রিকায় শেখে। মেয়েদের ম্যাগাজিন পড়ে আরও বেশি শেখে। মস্তিস্কের কোষে কোষে ঢুকে যায় এ জাতীয় *শিক্ষা।* ফলে,

নারীর অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান বুদ্ধি ধারণ করার ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে নারী অনেক কম রাখে।

সুন্দরীর সংজ্ঞা স্থান কাল ভেদে ভিন্ন রকম ছিল। আগে গায়ে গতরে মাংস থাকলে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী বলা হত। এখন যত হাড়সর্বস্ব হবে, যত রুগ্ন দেখতে হবে, না-খাওয়া-চেহারা হবে, তত সে সুন্দরী বলে বা পণ্য বলে গণ্য হবে। উনিশ শতকের চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে নারীদের ভারী তলপেট দেখলে মনে হয় বুঝি সকলেই সন্তান সম্ভবা। পেটের মেদ ঝরানোর কোনও নিয়ম তখন তৈরি হয়নি। এখন নিয়ম তৈরির পর শিল্পও বদলে গেছে। শিল্পও তো বেশ রমরমা শিল্প এখন। চারদিকে শরীরের স্বাভাবিক মেদ মাংস ঝরানোর প্রতিযোগিতা চলছে। বিশেষ করে তরুণিদের মধ্যে। অনেকে বলে, *ঠাকুরমা দিদিমারা অনেক বেশি স্বাধীন ছিল এই জমানার মেয়েদের চেয়ে। তারা অনেক বেশি নিশ্চিন্তে ছিল তাদের যা আছে তাই নিয়ে। নিজেদের শরীরের গড়ন নিয়ে তাদের হীনমন্যতায় ভুগতে হত না, নাক চোখ মুখ পরিবর্তনের জন্য চাপও অনুভব করতো না।* হ্যাঁ, আগে যেমন তেমন *দাসি* হলেই চলতো। এখন *সুন্দরী দাসি* চাই। দিন দিন পুরুষের চাহিদা বাড়ছে। আর বাজার পরিকল্পনায় চাহিদা মাফিক নারী-পণ্য তৈরির ব্যবস্থা জোরদার হচ্ছে। শক্তিশালী *মিডিয়া* এবং *মার্কেট* সুন্দরী নারীর মডেল বা স্যাম্পল দেখিয়ে দিয়েছে, এখন এই ট্র্যাপে মেয়েরা টুপটুপ করে পড়ছে। সুন্দরী অসুন্দরী দু জাতের মাথায় স্বাভাবিকভাবেই মারাত্মক একটি চাপ। অসুন্দরীকে *সুন্দরী* হতে হবে, সুন্দরীকে *সুন্দরী*ই থেকে যেতে হবে। এই চাপে, মস্তিস্ক সেই মেয়েদের যত না ভোঁতা, তার চেয়েও ভোঁতা হচ্ছে আরও। তাবৎ সম্ভাবনার ইতি ঘটিয়ে নিজেদের *বেশ্যায়* পরিণত করছে মেয়েরা। বেশ্যালয়ে বাস করে *অভদ্র বেশ্যা,* আর

বেশ্যালয়ের বাইরে বাস করে *ভদ্র বেশ্যা।* দুজনেরই কাজ পুরুষকে মুগ্ধ করা, পুরুষকে আমোদ আহলাদ দেওয়া, *যারপরনাই আনন্দ* দেওয়া।

শারীরিক সৌন্দর্যই এই পচা পুরোনো পিছিয়ে থাকা সমাজে একটি মেয়ের *প্রধান সম্পদ। সম্পদহীন* মেয়ের জীবন রাস্তার কুকুর বেড়ালের মত, দুর্বিসহ। বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা দেশের সুন্দরীর সংজ্ঞা এখন ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। সংজ্ঞা অন্তঃস্থ করছে আপামর জনগণ। চিন জাপানের মেয়েরাও এখন চোখ বড় করতে চাইছে, নাক টিকোলো করতে চাইছে। পারলে *জিন* পাল্টে দেয়। *ডিএনএ* র দিক নিশানা ঘুরিয়ে দেয়। পশ্চিমা দেশের পুরুষেরা নারীর ঠ্যাং দেখে পুলকিত হয়। ঠ্যাং নিয়ে আদিখ্যেতা কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও করেনি। কিন্তু হালের বিশ্বায়ন পশ্চিমের ঠ্যাং পূবে এনে ছেড়েছে। এখন ঠ্যাং দেখিয়ে মেয়েরা হাঁটা চলা করতে বাধ্য হচ্ছে। প্যান্ট বা স্কার্ট ওপরে উঠতে উঠতে নিতম্ব ছুঁই ছুঁই করছে। ভরা গালের সৌন্দর্যও এখন ভাঙা গালে এসে ঠেকেছে। পণ্যের আধুনিকিকরণ হচ্ছে, একই সঙ্গে নারীপণ্যের গায়েও যুগের হাওয়া। দখিনী হাওয়ার বদলে পশ্চিমী হাওয়া।

আমার বড় ভয় হয়। আরও ঘোর পিতৃতন্ত্রের কাদায় আমাদের সমাজসংসার ডুবে যাচ্ছে দেখে ভয়। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সমাজে প্রতিষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক স্বনির্ভর মেয়েদের যখন ভয়াবহ সাজসজ্জার চেহারা দেখি। কেন তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব! যদি তাদেরই অভাববোধ থাকে, তবে সাধারণ পরনির্ভর মেয়েদের উপায় কী হবে? সহস্র বছরের পরাধিনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরোনোর সংগ্রাম নারীরা কী করে করবে যদি নিজের শরীর নিয়ে তাদের

নিজেরই লজ্জা পেতে হয়! মুখে *চুনকালি* না মাখলে যদি সে নিজেকে যোগ্য মনে না করে চোখ তুলে তাকাবার, তবে শৃঙ্খল ছেঁড়া তো হবেই না, বরং আরও কঠিন শৃঙ্খলে সে নিজেকেই জড়াবে আরও।

পশ্চিমের নারীবাদী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল ষাট দশকে। কুৎসিত পুরুষতন্ত্রের গালে কষে থাপ্পড় লাগিয়ে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রক্ষণশীল পুরুষেরা তখন নিরবে নারীর উত্থান হজম করলেও এখন উগরে দিচ্ছে। হজম শেষ পর্যন্ত হয়না ওদের। এখন নারীকে পুতুল বানানোর চেষ্টাই তখনকার সেই সফল নারী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া। এখন নারীকে একশ বছর পিছনে টেনে নেবার ষড়যন্ত্র চলছে। নারী আবার শেকল পরো, সাজো, সুন্দরী হও, ঘরে বাইরে সুন্দরী প্রতিযোগিতার দৌড়ে কোমর বেঁধে নেমে পরো, এখন নারী-মাংস বিক্রির হাট বসাও চারদিকে। দুঃখ এই, পশ্চিমের *নারীবাদী আন্দোলন* এই ভারতবর্ষে এলো না, এলো তার *ব্যাকল্যাশ,* এলো নারীকে পণ্য করার সবরকম হৈ হুল্লোড়।

পটলচেরা চোখ, ফুলের মতো হাসি, কালো মেঘের মতো চুল, পীনোন্নত বুক, সুডোল বাহু ----মেয়েদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে এরকম লক্ষ উপমা এবং চিত্রকল্পের ব্যবহারই প্রমাণ করে যে মেয়েদের শরীরই শেষ পর্যন্ত সব। ছেলেটি ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা ব্যবসায়ী অথবা লেখক অথবা শিল্পী। মেয়েটি বেটে বা লম্বা, কালো বা ফর্সা, সুন্দরী বা অসুন্দরী। এখনও পুরুষের পরিচয় তার কর্মে আর নারীর পরিচয় সে দেখতে কেমন, তাতে। দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে এসব দেখেও মেয়েদের কেন রাগ হয় না? কেন বেশির ভাগ মেয়েই পরমানন্দে মেনে নেয় নারী পুরুষের বিকট বৈষম্য! কেন তারা প্রশ্ন করে না, কেন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে না, *আমরা যেমন আছি তেমনই থাকবো। আমরা বোধবুদ্ধি সম্পন্ন রক্ত মাংসের*

মানুষ, রং করা পুতুল নই। আমরা আসল-এ বিশ্বাসী, নকল-এ নয়। কতটুকু বিদ্যে আমাদের পেটে আছে, কতটুকু শিক্ষা মাথায়, কাজে কেমন পারদর্শী, আমাদের কীসে কেমন দক্ষতা ---সেগুলোই দেখার বা দেখাবার।

নিজেদের অধিকারের ব্যপারে সামান্য সচেতন হলে মেয়েরা নিশ্চয়ই বুঝতো যে জগতে যত নির্যাতন আছে মেয়েদের বিরুদ্ধে, সবচেয়ে বড় নির্যাতন হল, মেয়েদেরকে *সুন্দরী* হওয়ার জন্য লেলিয়ে দেওয়া। এর পিছনে যেন মেয়েদের অঢেল টাকা যায়, সময় যায়, মাথা যায়, যেন সর্বনাশ হয়। আর, পুরুষ নিশ্চিন্তে নিরাপদে ভূঁড়িঅলা, টাকঅলা, কুৎসিত কদাকার শরীর নিয়েও জগতের যাবতীয় ক্ষমতায় বহাল তবিয়তে বিরাজ করবে। কেউ তাদের শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে মোটেও ভাবিত হবে না। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে তাদের কাজকর্ম দেখে। এসবের কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম কখনও উদাহরণ হতে পারে না। অনেকে হয়ত বলবে সিনেমা থিয়েটার এবং বিজ্ঞাপনের জগতে পুরুষের সৌন্দর্য গোনা হয়। তা হয়ত হয় কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। সিনেমার কথা ধরি, দিলীপ কুমারের মতো ইয়া মোটা কোনও অভিনেত্রীকে ভাবা যায় তারকা হিসেবে? যে শরীর নিয়ে গোবিন্দা নায়ক হয়, কোনও মেয়েকে কি অমন স্থূল শরীরে নায়িকা করা হবে কখনও? অমিতাভ বচ্চন তাঁর ত্বকের একশ ভাঁজ নিয়েও আজ মেগা স্টার থেকে যেতে পারেন, রেখাকে কিন্তু বলিরেখা সব ঘুচিয়ে তবে টিকে থাকতে হচ্ছে! উত্তম কুমার ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন বয়স হলেও; চুলহীনতা, স্থূলতা, বলিরেখা নিয়েও যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তারকাখ্যাতি কমেনি, বরং বেড়েছে। সুচিত্রা সেনকে কিন্তু ঘরবন্দি

থাকতে হচ্ছে। বেরোলেই তাঁর তারকাখ্যাতি ঝটিতে বিদেয় হবে। এ কথা জানেন বলেই জনসমক্ষে তিনি চেহারা দেখান না। লুকিয়ে আছেন বছরের পর বছর। সুচিত্রা সেন খুব ভালো অভিনেত্রী ছিলেন, কিন্তু অত বড় অভিনেত্রীকেও মর্যাদা পেতে হয় তাঁর শরীরের কারণে। ত্বকে ভাঁজ পড়লে, স্তন নুয়ে পড়লে, চুলে পাক ধরলে, নারীরা, যত বড় অভিনেত্রীই তারা হোন না কেন, আর সম্মান পান না। অপর্ণা সেনএর প্রতিভার ধারে কাছে আসার যোগ্যতা হবে না অনেক পুরুষ-চিত্রপরিচালকের। কিন্তু তারপরও, অজান্তেই তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের *চমৎকার শিকার* হয়ে বসে আছেন। তাঁকেও কী ভযাবহরকম সাজতে হয়, প্রমাণ করতে হয় যে তিনি সুন্দরী! আর সাহিত্যের জগত? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চেহারা দেখুন, তারাপদ রায়কে দেখুন, এরকম চেহারা নিয়ে কোনও মেয়ে-লেখক কি দুদিনও টিকে থাকতে পারতো?